রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতা : পরম আশ্রয় এবং নিবিড় অনুভবের অনুসন্ধান

শিবনারায়ণ রাউত
গবেষক (পিএইচ.ডি) ,বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজা রামমোহনপুর,দার্জিলিং,পশ্চিমবঙ্গ

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
.... কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
ধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে

চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপ-খানি।
কে সে, চিনি নাই তারে...।"

।। ---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর /"চিত্রা"/"এবার ফিরাও মোরে" ।।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহোত্তম কবি। বাঙালির আধুনিক রুচি ও মানস গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। তাঁর লেখা, দর্শন, চিন্তা-চেতনার বহুমাত্রিক আলোকছটার ঔজ্জ্বল্য ও মহিমায় বাঙালির জাতিসত্বা মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। বাঙালিকে আবেগ-অনুভুতি প্রকাশের ভাষা দিয়েছেন তিনি। দেখার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন, দিয়েছেন সৃষ্টির প্রেরণা। বাঙালির শিক্ষা, নান্দনিক বোধ, সাংস্কৃতিক চর্চাা, দৈনন্দিন আবেগ-অনুভূতিতেও সারাক্ষণ জড়িয়ে আছেন তিনি। আছেন নি:শ্বাসে-বিশ্বাসে, বুদ্ধি-বোধ-মর্ম-কর্মে। তাঁকে পাওয়া যায় প্রেম-ভালোবাসা, প্রতিবাদ, আন্দোলনের অঙ্গীকার এবং তার আরাধনার নিবিষ্টতায়।

প্রত্যেক দেশে মহৎ কবির আবির্ভাব যখন ঘটে; তখন তিনি দেশের ভাষাকে রূপ দেন। তার সময় পর্যন্ত সে ভাষায় যে রূপ, সে অভিব্যক্তি থাকে, সেই অভিব্যক্তিকে আরও বিচিত্র করেন। ইংল্যান্ডে শেক্সপীয়র করেছিলেন, ইটালিতে দান্তে করেছিলেন, জার্মানীতে গ্যয়টে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেই কর্তব্য সাধন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে সৃষ্টির সূত্রপাতে বলেছিলেন-

“প্রতিটি আরম্ভের আগেও একটি আরম্ভ আছে। যেমন-একটা প্রদীপ যখন জ্বলে তার সলতে পিছন থেকে এগিয়ে দিতে হয়।”২

রবীন্দ্রনাথ মতে প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টা । সৃজনশীলতাতেই মানুষের সত্য পরিচয়। সৃষ্টির রাজ্যেই মানুষ প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। মানুষ যতক্ষণ প্রয়োজনে আবদ্ধ ততক্ষণ সে জীবমাত্র। মুক্ত চৈতন্যই সে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, শিল্পীরূপেই সে যথার্থ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ধর্মকে বলেছেন শিল্পীর ধর্ম। বলা বাহুল্য; এ ধর্ম আনুষ্ঠানিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। ধর্ম, জীবনদর্শন এবং সাধনা এখানে অভিন্ন্। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৃষ্টি থেকে আলাদা সৃষ্টিকর্তা নেই। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একই। সৃষ্টিকর্তা নিজেই নিজেকেই সৃষ্টি করেছেন অথবা করছেন। সৃষ্টি নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা। রবীন্দ্রনাথের মতে জগৎ-স্রষ্টার মতো মানুষও সৃষ্টিকর্তা। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে নানাভাবে, নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও বিচিত্রময়। মানুষও নিজেকে সৃষ্টি করে, নিজের জগৎকে সৃষ্টি করে, আবার বিশিষ্ট অর্থে আমরা যাকে আর্ট বলি, সাহিত্যে বলি, তাও সৃষ্টি করে। নিজেকে সৃষ্টি করার কারণেও মানুষ লীলাময়, আবার আর্ট বা সাহিত্যকে সৃষ্টি করার কারণেও মানুষ লীলাময়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে বলেছেন মানুষের-

"বৃহৎ বিচিত্র লীলা জগতের সৃষ্টি। জীবনে যেমন মানুষে অবিরত নিজেকে সৃষ্টি করে-করে চলে, সাহিত্যেও তাই।"৩

উভয় ক্ষেত্রে মানুষে আত্মসৃজন-পরায়ন। যে সৃজনশীলতা জীবনে, সেই একই সৃজনশীলতা সাহিত্যে। এই সৃজনশীলতাই মানুষের স্বধর্ম। রবীন্দ্রনাথের কাছে সব মানুষই সৃষ্টিকর্তা। মানুষের গোটা জীবনটাই একটা ছেদহীন সৃজনক্রিয়া। এ সৃজন কেবল ব্যক্তি মানুষের নয়-সর্ব মানবের, মানব সমগ্রতার। সমাজ সংসার সবই তার সৃষ্টি। মানব বিশ্ব তারই সৃষ্টি। মানবতাও তাই, মানবতা তো আলাদা কিছু নয়। মানবতাই নিজেকে সৃষ্টি করতে-করতে চলে।

শিল্প-সাহিত্য-সমাজ, কৃষি-রাজনীতি-জীবনাচার, আনন্দ-বিষাদ, পূর্ণতা-অপ্রাপ্তি, সমস্যা ও সম্ভাবনা— সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিচরণ। সমকালে যেমন উত্তরকালেও তাই তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। মানুষের জন্য, সুন্দরভাবে জীবনযাপনের শিল্পকলা আয়ত্ব ও চর্চা করার জন্য তার অনুভূতি এবং ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য বিরাট প্রেরণার উৎসভূমি। বিশ্বমানবতা এবং শান্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অমিত ইচ্ছা ও সাধনার পরিচয় বহন করছে অনুকরণীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'শান্তি নিকেতন'। এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, সারাপৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষা-সংস্কৃতির মানুষের সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের তীর্থভূমি। জ্ঞানের সাথে ভালোবাসার, সাধনার সাথে সম্মানের সংযোগ না থাকলে যে মানবিক বৃত্তির বিকাশ কিংবা প্রকাশ কোনোটাই সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আর চিন্তার বড়ত্বের কারণেই তিনি দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন। বাঙালিকে তিনি বিশ্ব দরবারে সম্মানের জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন তার বিশ্বমনস্ক মানবিকতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনার কারণে। শিক্ষা-শান্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় তিনি যেমন হাত পেতেছেন সবার কাছে, তেমনি সকলে তার দিকে হাত প্রসারিতও করেছেন। সভ্যতার সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তার যে আকাঙ্ক্ষার কথা আমরা জানি, তা তার বিশেষ অভিজ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রাজনীতিতে বাম-ডান পেরিয়ে জ্ঞানপন্থায় আস্থা অর্জনের যে নীতিতে বিশ্বাস করেন সাম্প্রতিক সময়ের পেরুর তথা বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক মারিও ভার্গাস য়োসা, সেই আলোয় অনেককাল আগেই স্নাত হয়েছেন 'আমাদেরই লোক' রবীন্দ্রনাথ।নোবেল বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-- এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির, এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সংঘাত হওয়ার মধ্যে নয়, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে একের সঙ্গে সৌভ্রাত্র আর শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাওয়া, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন পুনরুদ্ধার করা। আমরা তো হিংস্র পশু নই। এখন আত্মস্বার্থ আমাদের জীবনকে অধিকতর প্রভাবিত করছে, এই

আত্মস্বার্থই আমাদের বিচ্ছিন্ন করছে, দুঃখ দিচ্ছে, হিংসা ও ঘৃণাবোধের জন্ম দিচ্ছে, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলছে।

রবীন্দ্রনাথ মূলত: এবং প্রধানত কবি কিন্তু যেহেতু তাঁর কবিতা দর্শন সমৃদ্ধ, সেহেতু তিনি শুধু কবিই নন বরং দার্শনিকও বটে। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কবি বলেই দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁর একটি মাত্র পরিচয় তিনি শিল্পী। কাব্যসৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে হলে যে দার্শনিক অনুভূতির প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' সেই পথেরই যাত্রী। রবীন্দ্রনাথের গভীর জীবনবোধ, বিশ্ববোধ ও পারলৌকিকবোধ বা ঈশ্বরানুভূতি। এই তিনটি সত্তার অস্তীত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে যে প্রজ্ঞার দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাই তাঁর কাব্যে বিধৃত জীবন-দর্শন ও মানবতাবাদের মূল সুর। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি সত্তাই তাঁর কবিতায়ে সবচেয়ে বেশি ছায়াসম্পাৎ করেছে।তাই একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা একই উৎসমুখ হতে প্রবাহমান।

জীবনের ক্ষেত্রে কোন স্থবিরতা বা জড়তাকে কবি চরম বলে মেনে না নিয়ে গতির মহা আহবানকেই সাদরে বরণ করে নিয়ে দীপ্ত কন্ঠে উচ্চারণ করেন-

"ধ্বনিয়া উঠিছে শুণ্য নিখিলের পাখার এ গানে।

হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।"৪

রবীন্দ্রনাথের কবিতা কখনো মর্ত্যচেতনা, আত্মচেতনা, কখনো ব্যঙ্গ কৌতুক, আবার কখনো প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে বিশ্বচেতনায় সমকালসংলগ্ন হয়ে উঠেছে। তিনি এক অর্থে মরমি কবিও। কারণ উপনিষদের ঋষিসুলভ প্রত্যয় তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। সুফিবাদের ধারা, কবির ও রামপ্রসাদ সেনের আলিঙ্গন তাঁকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতা গ্রাম বাংলার বাউল ফকিরদের দ্বারাও সমৃদ্ধ হয়েছে। বাউলের 'মনের মানুষে'র মতোই তিনি 'জীবনদেবতা' সৃষ্টি করেছেন। শিলাইদহে থাকার সময় তিনি দেখেছেন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও রক্ষণশীল সমাজের বাইরে বৈষ্ণব-বাউলদের অধ্যাত্ম সাধনা। তাঁর ১৭ বছর বয়সের রচনা 'ভানুসিংহের পদাবলীতে'ও ছিল রাধা-কৃষ্ণের অনুষঙ্গ।

সমগ্র জীবনের সাহিত্যকর্মে রবীন্দ্রনাথ অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। যিশু খ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ ও হজরত মুহম্মদকে (সা.) নিয়ে লিখেছেন প্রবন্ধ। বাংলা সাহিত্য তাঁর প্রচেষ্টার পথ ধরেই এখন পর্যন্ত উদার মানবতার কথা ব্যক্ত করে চলেছে। তিনি উপনিষদের ধর্মীয় আরাধনার পথ বেয়ে মানুষের ধর্মে উপনীত হয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে। বর্তমান প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথ চর্চার মাধ্যমে সেই 'মানুষের ধর্ম' জীবন ও সাহিত্যে প্রকটিত করে তুলতে পারেন। 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার দলিল। অন্যদিকে 'গীতাঞ্জলি'সহ অনেক কাব্যের মৌল

অনুষঙ্গ অধ্যাত্মবাদ। প্রথম তিনটি গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো কবির ধর্মোপদেশের সংগ্রহ কিংবা শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পরে রচিত। তিনি সাধারণের কাছে ধর্মতত্ত্বের কথা বলেছেন সহজ অনুভবের প্রান্ত থেকে।

কবির যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতের পালা শুরু হয় 'গীতাঞ্জলি' পর্বে। তাঁর ধর্মদেশনায় শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী মানুষের ধর্মকথা প্রকাশিত হয়নি বরং সাধারণ ব্রাত্য মানুষের কথা বলেছেন তিনি। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ কবির নিজের জীবনের পূর্ণতার জন্য কেবল নয়, বৃহত্তর হিন্দুসমাজের জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যক মনে করেছিলেন। এ জন্য ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনার চেয়ে সমাজগত ধর্মসাধনার দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জন্মভূমি হিসেবে যথাক্রমে তিনটি স্থান, অর্থাৎ পৃথিবী, স্মৃতিলোক এবং আত্মিকলোককে নির্দিষ্ট করেছেন তাঁর 'মানবসত্য' (মানুষের ধর্ম) প্রবন্ধে। 'আত্মিকলোক'কে তিনি বলেছেন, 'সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ'। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। উপরন্তু এই চিত্তলোক বিশ্বগত হলেই মানুষ সত্যের জন্য প্রাণ দিতে উৎসুক হয়ে ওঠে। সর্বমানবের চিত্তের উপস্থিতির কারণে মানুষ মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে। অন্যের প্রাণ রক্ষায় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে। সর্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত এই ভাবনা মানুষের পরমার্থ চিন্তার অংশ। অর্থাৎ সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগ, করুণা, নিঃস্বার্থপরতা, পরহিতব্রত কাজ এবং নিজের জীবনের প্রশান্তিকে অধ্যাত্মবাদের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। অশান্তি, অসন্তোষ এবং বাস্তব জীবনের বিড়ম্বনা মানুষকে আধ্যাত্মিকতায় উৎসাহী করে। দেহ ও আত্মার শান্তি পাওয়ার জন্য মানুষের অদম্য চেষ্টা অতীতকাল থেকে। বর্তমান বিশ্বে আধ্যাত্মিকতার অনুধ্যান ও অনুশীলন এবং পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষকে হতাশা থেকে মুক্তি দিচ্ছে আধ্যাত্মিকতা, তার বিষণ্ণতা দূর হচ্ছে, শরীর ঠিক থাকছে। ধূমপান, মদ্যপানের মতো খারাপ অভ্যাস থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে পারছে। ঈশ্বর ও মানুষের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা তথা ঈশ্বর বিশ্বাস, আচরণ এবং চর্চা প্রশান্তির সূত্র। বিশ্বাস, আশা, ক্ষমা, অন্যের জন্য চিন্তা করা, প্রার্থনা এর সবই সুস্বাস্থ্যের জন্য অনিবার্য।রবীন্দ্র-আধ্যাত্মিকতার মূলে আছে বিশ্ব নিয়ন্তার প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাস মানুষকে অনেক বাস্তব চাপ থেকে মুক্ত করে।

মূলত;রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শন ও মানবতাবোধের পরিপূর্ণ বহি:প্রকাশ 'বলাকা' কাব্যের যুগেই বিশিষ্টতার সাথে বিকশিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের এ মানস প্রবনতা নতুন কোন দার্শনিক উপলব্ধি নয় বরং প্রভাত সঙ্গীতের সময় হতেই তা মন্থর গতিতে সম্মুখ পানে অগ্রসর হচ্ছিল। 'বলাকা' যুগের অনুকুল আবহাওয়া, কালের ব্যাপ্তি, কবির মনন চর্চা ও পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা তাকে ফুলে-ফলে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভূত শক্তি যুগিয়েছে মাত্র। রাবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক উপলব্ধির দ্বারা এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে, আনন্দের এক পরম ও চরমতম উৎস রয়েছে। সেই উসের মাঝে একাত্ম হবার জন্য আত্মোৎসর্গ করার মাঝেই মানব জীবনের প্রকৃত স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে। আত্মঅহমিকার অশুভ প্রভাব মুক্ত মানবতার এই আকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্র কাব্যে বিবৃত জীবন দর্শন ও মানবতার মূল সূত্র। 'বলাকা' কাব্যের কবিতায় কবির এ দার্শনিক উপলব্ধি অত্যন্ত

তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে-

"কী প্রলাপ কহে কবি।

তুমি ছবি?

নহে নহে, নও শুধু ছবি

কে বলে রয়েছে স্থির রেখার বন্ধনে

নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?" ৫

রবীন্দ্রনাথ উদার বিশ্বমানবিকতার কবি। বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সংস্কারমুক্ত ও ভেদাভেদশূন্য। প্রথমদিকে সমাজ ও ধর্মের সংস্কার ও বিশ্বাসের বেড়াজাল সৃষ্টি হলেও সেই উচ্ছ্বাস ও আবেগ থেকে তিনি মুক্ত হয়ে মানবিক সত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মণের মিথ্যা গরিমাকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছেন তেমনি হিন্দুদের দ্বারা কথিত ম্লেচ্ছ মুসলমানকে সম্মান করেছেন। "কাহিনী" কাব্যের ‘সতী’ কবিতায় আছে :

‘বৃথা আচার বিচার। সমাজের চেয়ে

হৃদয়ের নিত্য ধর্ম সত্য চিরদিন।’৬

সংস্কারমুক্ত কবি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে পরিহার করেছেন। জাতপাতের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর তীব্র হয়েছে পত্রপুট কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতায়। যেখানে অন্ত্যজ মন্ত্রবর্জিতের পক্ষে কবির চেতনা। তিনি সহজ ভক্তির আলোকে দেবতাকে পেতে চেয়েছেন। আচার সংস্কার মন্ত্র ও মন্দিরের ভেতরে নয়। এ জন্য গীতাঞ্জলির ১১৯ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায় দেবতা বদ্ধ ঘরে নেই তিনি আছেন রৌদ্র ধূলায় চাষা আর শ্রমিকের মাঝে। অবজ্ঞাত, হীন, পতিত অন্ত্যজের মধ্যে কবি দেবতা খুঁজেছেন। এ যেন মাদার তেরেসার কুষ্ঠ রোগী ও আর্তমানবতার পরিচর্যার মধ্যে যিশু খ্রিস্টের অন্বেষণ। গীতাঞ্জলির ১০৭ সংখ্যক কবিতায় কবি সব হারাদের মাঝে দেবতাকে পেয়েছেন আমরা দেখতে পাই-

"যেথায় থাকে সবার অধম

দীনের হতে দীন

সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে

সবার পিছে, সবার নিচে

সব হারাদের মাঝে।"৭

কবি সকল গণ্ডি, সমস্ত সম্প্রদায় বিভেদ বৈষম্যের ঊর্ধ্বে মানুষের ঈশ্বরের সাধনা করেছেন, আরাধনা করেছেন। মানুষের মাঝে দেবতাকে পেয়েছেন। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে নিজের সাধনা সম্পর্কে বলেছেন-

"আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে, তিনি নিখিল মানবের আত্মা।" ৮ (মানবসত্য)

এই নিখিল মানবের আত্মাকে উপলব্ধি করার সাধনাই কবির ধর্মসাধনার পরিণাম। নিখিল মানবের আত্মার স্বরূপ হচ্ছে সর্বজনীন মানব বা পরম পুরুষ। যিনি সব মানুষের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থেকে মহত্বের শ্রেয়োবোধের প্রেরণা দিচ্ছেন। চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তার পরিচয় আছে-

"কে সে? জানি না কে? চিনি নাই তারে

শুধু এইটুকু জানি— তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে

চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে

ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে

অন্তরপ্রদীপখানি।'৯

মানুষের অন্তরে এক মহামানবত্বের প্রেরণা, যা তাকে অনুপ্রাণিত করে মহত্বের পথে নিয়ে যায় তাকে অনুভব করেন কবি। তবে মহামানবের কর্ণে তার আহ্বান পৌঁছায় সবার আগে। তাঁরা সংসারের সীমা ছেড়ে ছুটে আসেন। নতুন নতুন ত্যাগ ও দুঃখ বোধ প্রকাশিত হয়। মানুষের অন্তর্নিবিষ্ট মহামানবই কবির 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। মহামানবকে লাভ করার সাধনাই কবির ধর্ম সাধনা। এর নাম মানুষের ধর্ম।

কবির আত্মদর্শন বা পরমার্থচেতনা বিভিন্ন কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। গীতমাল্যের ৪১ সংখ্যক কবিতায় মহামানবকে লাভ করার জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণ করে মানবাত্মার অভিসারের কথা

বলা হয়েছে। দুঃখকে আত্মসাৎ করার আনন্দের কথা 'আত্মপরিচয়ে' বলেছেন তিনি। দুঃখের মধ্য দিয়ে সুন্দরের পরমসত্তার আবির্ভাব ঘটে। মানবাত্মা পরিশুদ্ধ হয়। গীতবিতানের পূজা পর্বের ৯১ সংখ্যক গানে আছে–

"দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ
তোমার ঘুচবে কবে।
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।
...মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।" ১০

কবির দেবতা রুদ্র, শান্ত, শিবম। দুঃখ আঘাতে তাঁকে পাওয়া যায়। খেয়ার 'আগমন'–এ আছে সেই রুদ্র রূপ–

'এই করেছ ভালো নিঠুর' কিংবা 'আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে'– দুঃখকে আহ্বান করার গান। দুঃখ ও কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মহামানবের সাধনা পূর্ণ হয়। তবে তাঁর সাহচর্য কখনো কখনো আনন্দময়।

বিভিন্ন কবিতায় ব্যক্ত 'খেলার সঙ্গিনী', 'নর্মসহচরী', 'মানসসুন্দরী' কবির জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী জীবনদেবতায় পরিণত। চিত্রা কাব্যের জীবনদেবতা, রাজা, অরূপরতন নাটকের রাজা এবং খেয়া কাব্যের দুঃখরাতের রাজা ও রাজার দুলাল একই সত্তার ভিন্ন রূপ। একই দেবতা বিচিত্র রূপে কবির কাছে দেখা দিয়েছে। গীতাঞ্জলির ৬৭ গানে আছে প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে কবি তার অমৃত স্পর্শ লাভ করেছেন। হৃদয়দেবতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভুবনের প্রতি কবির ছিল বিস্ময়।গীতাঞ্জলির ১২০–এ আছে–

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ

তাই এত মধুর।" ১১

জগতের সামান্য বস্তুর মধ্যেও অপরিমেয়তার অশেষ ব্যঞ্জনা আছে। কবি বিশ্বপ্রকৃতিতে নিসর্গ সৌন্দর্যে মানব সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে সীমাহীন অনির্বচনীয়তা লক্ষ্য করেছেন। অনন্ত অসীম পরম রহস্যময় প্রকাশ, 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।' গীতাঞ্জলির ৩০ সংখ্যক এ সৃষ্টির সকল আনন্দময় প্রকাশ আছে। আস্তিক্য অনুভূতির গভীর ঐকান্তিকতা লক্ষণীয় :

'এই তো তোমার প্রেম ওগো

হৃদয় হরণ।

এই যে পাতায় আলো নাচে

সোনার বরণ।"১২

শান্তিনিকেতনের মন্দিরে কবি যিশু খ্রিস্ট, চৈতন্য সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ও হজরত মুহম্মদের স্মরণদিন পালন করা শুরু করেছিলেন। ধর্মসম্পর্কে কবির উপনিষদের জ্ঞান পূর্ণতা পায় মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তদের জীবনীর আলোকে। ভারতের ধর্মসাধনার ধারা বহন করেছেন তিনি। রবীন্দ্রজীবনী রচয়িতা প্রভাতকুমার বলেছেন, 'তাঁর ধর্ম মানবতার ধর্ম-কর্মে কঠোর, জ্ঞানে উজ্জ্বল, ভক্তিতে রসাপ্লুত, সৌন্দর্যে সমন্বিত।' প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা সম্পর্কে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন যাতে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে, যাতে উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী-করুণা এবং বৈষ্ণব ও খ্রিস্টধর্মের প্রেমভক্তি একত্র সমন্বিত হয়েছে, অথচ যা সর্বতোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী। সে মন একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ, আচারপদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী।'

মূলত মানুষের ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার পরিপূর্ণবিকাশ ধর্মজীবনের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবন বা আধ্যাত্মিকতা ছিল সেই আদর্শের চূড়ান্ত নিদর্শন। 'গীতালি'র প্রথম গানটি তাই-

"এতদিনে জানলেম

যে কাঁদন কাঁদলেম

সে কাহার জন্য।

ধন্য এ জাগরণ,

ধন্য এ ক্রন্দন,

ধন্য রে ধন্য।" ১৩

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য সাধনার দ্বারা মানবজীবনের অন্তর্নিহিত গূঢ় অনেক অর্থকে সত্য ও সুন্দরের মাঝে উত্তীর্ণ করে দেবার সাধনায় সদা আত্ম নিমগ্ন ছিলেন। কবির অনুধ্যানে গতিতত্ত্ব যে দার্শনিকতাকে ব্যক্ত করেছেন তা তাঁর অকৃত্রিম মনবদরদী হৃদয়েরই বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।আজ থেকে একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তার নোবেল ভাষণের প্রায় শেষপ্রান্তে মানবজাতির শান্তির জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন: 'আমাদের আরো গভীরে যেতে হবে। আমাদের আবিষ্কার করতে হবে ঐক্যের কোনো গভীরতম ভিত্তি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যা আত্মিক ঐক্য গড়ে দেবে। মানুষের চেতনার গভীর আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে মানবজাতির সমস্ত ধরনের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মহান ঐক্যের কোন ধরনের বন্ধন কার্যকর। আর এই কর্তব্য সম্পাদনের যথার্থ যোগ্যতা আমাদের রয়েছে। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের অবিনশ্বর কৃতির উত্তরাধিকারী, সেইসব মহান ঋষি যাঁরা ঐক্য আর সংবেদনের ধর্ম প্রচার করে ঘোষণা করেছিলেন: যে সর্বভূৎকে আত্মবৎ মনে করে, যে সর্বজীবকে আত্মবৎ উপলব্ধি করে, সেই যথার্থ সত্যদ্রষ্টা।' রবীন্দ্রনাথ এখনও নমস্য। তার ভাবনা এবং প্রত্যক্ষ কর্মসূচি বিশ্বমানবতার জন্য বিশেষ বারতা হয়ে থাকবে আরো বহুদিন। সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আমরাও আজ বলতে পারি— মানুষের জন্য পৃথিবীর সকল সুখ-শান্তি ও সম্পর্ক, পৃথিবীর দৃশ্য ও কাঠামো পরিবর্তনের জন্য মানুষের বেঁচেথাকা ও মৃত্যু নয়।সম্পূর্ণ মানবতার খোঁজ পেতে গেলে হাত বাড়াতেই হবে রবীন্দ্র সাহিত্যে-

"আমার পৃথিবী তুমি

বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে

আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে

অশ্রান্ত চরণে।" ১৪

উদ্ধৃতি সূত্র

----

১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "আমি", "শ্যামলী",রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড) , রিফ্লেক্ট পাবলিশার,২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুলাই -২০১১, পৃষ্ঠা-৫৬

২) রায় সত্যেন্দ্রনাথ-- "রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ", বিশ্বভারতী প্রকাশন, শান্তিনিকেতন, প্রথম প্রকাশ-মে, ১৯৭৪,পৃষ্ঠা-৭৬

৩) তদেব- পৃষ্ঠা- ৭৮

৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "বলাকা",রবীন্দ্র রচনাবলী(চতুর্থ খন্ড) ,রিফ্লেক্ট পাবলিশার ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুলাই -২০১১, পৃষ্ঠা-৮৮

৫) ঐ : পৃষ্ঠা-৮৯

৬)ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ :"কাহিনী","সতী", রবীন্দ্র রচনাবলী(চতুর্থ খন্ড) ,রিফ্লেক্ট পাবলিশার ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুলাই -২০১১, পৃষ্ঠা-৬৭

৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "গীতাঞ্জলি ",রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড) ,রিফ্লেক্ট পাবলিশার ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুন -২০১৩, পৃষ্ঠা-২২৩

৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "মানুষের ধর্ম ",রবীন্দ্র রচনাবলী(সপ্তম খন্ড) ,রিফ্লেক্ট পাবলিশার ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- মার্চ -২০১৩, পৃষ্ঠা-১৬৭

৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "চিত্রা",", এবার ফিরাও মোরে", রবীন্দ্র রচনাবলী(চতুর্থ খন্ড) ,রিফ্লেক্ট পাবলিশার ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুলাই -২০১১, পৃষ্ঠা-৩৪

১০)ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "গীতবিতান ",রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড) ,রিফ্লেক্ট পাবলিশার ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুন -২০১৩, পৃষ্ঠা-২২৩

১১)ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "গীতাঞ্জলি ",রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড) ,রিফ্লেক্ট পাবলিশার ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুন -২০১৩, পৃষ্ঠা-২২৫

১২) তদেব : পৃষ্ঠা-২২৭

১৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "গীতালি ",রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড) ,রিফ্লেক্ট পাবলিশার ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুন -২০১৩, পৃষ্ঠা-১৮৮

১৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : "সোনার তরী",রিফ্লেক্ট পাবলিশার, রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড) , ২০, মহত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুলাই -২০১১, পৃষ্ঠা-৯৬